মিখাইল বাখতিন : উপন্যাসের সমস্যা

শিবাজীপ্রতিম বসু

একটি স্বপ্নের প্রস্তাবনা

'হ য ব র ল'র নেড়ার বিচারের গল্পটা একটু অন্যভাবে সাজানো যাক : সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার চলেছে—কাব্য ও গদ্যের মধ্যে। তবে এই সভায় কাব্যপক্ষ একাধারে বিচারপ্রার্থী ও উকিল। শামলা গায়ে জোর গলায় তারা প্রতিপক্ষকে তুলোধুনো করে দিচ্ছে— জোরালো তাদের সওয়াল।

অন্যদিকে, গদ্যপক্ষ নেড়ার মতো নার্ভাস হাসছে। সে যেন বুঝেই ফেলেছে এই বিচারের ফলাফল। আর বিচারকবেশী সাহিত্য-সমালোচক কলম হাতে ঢুলছে, মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ছে। কাব্যপক্ষ (অর্থাৎ, কবির দল) আরিস্ততল, কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দিচ্ছে কারা শ্রেষ্ঠত্বের হকদার। কখনো ঠোঁটে তাচ্ছিল্য নিয়ে তারা শোনাচ্ছে : সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। বিচারক মাথা নাড়ছে। কখনো বা সদম্ভে বলছে : তুমি গদ্যের সভায় যাবে যাও··· যেন লোকে বলে রাজা এসেছিল।

বিচার শেষ হতে চলেছে। আসামি চিহ্নিত। বিচারক নেড়া-গদের তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসির হুকুম লেখার জন্য নড়েচড়ে বসেছেন···

এমন সময় কোথা থেকে— আমাদের স্বপ্ন-কাঠামোর বাইরে থেকে, চেনা বিশ্বের অন্যপার থেকে, এসে দাঁড়ালেন মিখাইল বাখতিন। শ্লেষে/দম্ভে বিচলিত না হয়ে বিশ্লেষণের গভীরতায় সাজাতে লাগলেন গদ্যসাহিত্যের পক্ষে যুক্তির এক একটি ক্রম এবং সবশেষে সমালোচনার তীরটি ঘুরিয়ে দিলেন এ-তাবৎ শিরোপার দাবিদার কাব্য-পক্ষের দিকে। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, উপস্থাপনায় এমন এক অভিনবত্ব ছিল যে স্বয়ং বিচারক হাততালি দিয়ে উঠল। সভা ভেঙে গেল।

সাহিত্যতত্ত্ব : 'তাহাদের' কথা : এক

বলা বাহুল্য, মিখাইল বাখতিন গদ্যের তত্ত্বকার বা বলা ভালো, তিনি উপন্যাসের তত্ত্বকার ও তার গরিমা-গায়ক। কিন্তু তাঁর তত্ত্ব, অবদান ও উত্তরাধিকার আলোচনার আগে একটা পুরনো প্রসঙ্গ ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

তা হল, 'সাহিত্য' কী এবং কীভাবে তা সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দুভাবে দেওয়া চলে। এক, সাহিত্যকৃতিকে একজন সাহিত্যিকের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা, অর্থাৎ মনে করা যে একজন সাহিত্যিকের কিছু বক্তব্য/অনুভূতি ইত্যাদি আছে, যা সে নিজের মতো করে অন্যদের বলতে চাইছে : এই প্রয়োজন থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টি। অতএব, সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আবশ্যক হল, সাহিত্যস্রষ্টার অনুভূতি / বক্তব্য এবং তার পেছনে যে মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বর্তমান তা খুঁজে বের করা। অর্থাৎ লেখকের জীবন ও জগতের নানা রহস্য উন্মোচন করা, তবেই পাওয়া যাবে সাহিত্যমূল্য/অর্থের হদিশ। কারণ, সাহিত্যকর্মের নিয়ন্ত্রক বা বিধাতা হলেন স্বয়ং লেখক।

কিন্তু ওপরের যুক্তিশৃঙ্খল একটি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে না, তা হল, **কীভাবে** কোনো বক্তব্য বা অনুভূতি সাহিত্য হয়ে ওঠে? অথবা কোন্ উপায়ে কিছু বক্তব্য সাহিত্যপদবাচ্য হয়, আর কিছু বক্তব্য দৈনন্দিন গৌণ কথাবার্তায় পর্যবসিত হয়? এই পার্থক্য নির্দেশ করার সম্ভাব্য উত্তর হল : সাহিত্যস্রষ্টা এমন কিছু **বিশেষ চেহারায়** বা কাঠামোয় তাঁর বক্তব্য/অনুভূতি উপস্থাপন করেন, যা সাধারণ কথাবার্তার ধরন বা রূপের চেয়ে বহুলাংশে ভিন্ন। অর্থাৎ সাহিত্য তাহলে হল, বক্তব্য। অনুভূতি প্রকাশের একটি বা অগুণতি বিশেষ রূপ বা ফর্ম। এখান থেকেই সাহিত্য-সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি যাত্রা শুরু করে— যা লেখকের চেয়ে **লেখার** ওপরে, বিষয়ের চেয়ে রূপের ওপরে, তার কলাকৌশলের ওপরে জোর দিয়ে থাকে।

প্রথম মতটির ঐতিহ্য খুব পাকা। বিশেষত, বিদ্যায়তনিক চর্চায়, যথা ক্লাসরুম শিক্ষণে, সাহিত্যের 'ইতিহাস' চর্চায়, টেক্সট এবং নোটবুকের পরম্পরায়, এমনকি সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে প্রথম ধারণাটি প্রোথিত 'পরমধন'।

দ্বিতীয় মতটি অর্বাচীন। গত শতকের শেষদিকে তার তাত্ত্বিক আভাস, এই শতকের

গোড়ার দিকে ইয়োরোপের কয়েকটি দেশে কিছু মনস্ক গোষ্ঠীর অনাড়ম্বর আলোচনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মুখ্যত ফ্রান্স ও আমেরিকার সাহিত্য সমালোচনা এবং সর্বোপরি ছয়ের দশক থেকে এ-তাবৎ 'সবচেয়ে প্রভাবশালী' বৌদ্ধিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, যা বিশ্বের [পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত] চিন্তাশীল মানুষের নজর কেড়েছে।

সাহিত্য সমালোচনায় মিখাইল বাখতিনের অবদান/গুরুত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে এই দুটি মতের কথাই (বিশেষত তাদের অন্তর্নিহিত টেনশনের কথা) আমাদের কমবেশি মনে রাখতে হবে, যদিও [বর্জনে-গ্রহণে] দ্বিতীয় মতধারাটির সঙ্গেই চলেছে বাখতিন ও তাঁর পদ্ধতির দ্বন্দ্ব বা [বাখতিনের ভাষায়] 'ডায়ালগ'।

মুখ্যত ইয়োরোপীয় উৎসের সমালোচনার এই ঘরানার অনুপ্রেরণার কেন্দ্রস্থল ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুরের ভাষাতত্ত্বচর্চা, যা কোনো ভাষার ঐতিহাসিক আলোচনার (diachrony) পরিবর্তে তাকে একটি নির্দিষ্ট সমাজ-সংস্কৃতিতে অর্থবহ 'স্বেচ্ছাচারী' (arbitrary) চিহ্নের (sign) বিজ্ঞান (যার পদ্ধতিগত নাম—synchrony) হিসেবে দেখতে চায়। সস্যুর অবশ্য ভাষাকে ব্যাকরণবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ভাষা (langue) এবং ব্যবহৃত বা কথিতভাষা (parole)— এই দুইভাগে ভেঙে, আনুষ্ঠানিক ভাষার ওপরেই চিহ্ন বিজ্ঞানকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। এছাড়া ভাষা ব্যতীত সমাজ সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে ধারণা ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও অর্থবহ হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিহ্নের দ্বারা— সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই চিহ্নবিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব মনে করতেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের চিহ্নবিজ্ঞান নিয়েই গড়ে উঠবে 'চিহ্নতত্ত্ব'(Semiology)।

সস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার প্রবল প্রভাব পড়েছিল পরবর্তীকালের সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান চর্চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে, বিশেষত ছয়ের দশকের গোড়া থেকেই লেভি স্ট্রসের নৃতত্ত্ব, রলাঁ বার্থের সাহিত্য সমালোচনা বা আলথুসারের মার্কসের রচনা 'পাঠে'— যা স্ট্রাকচারালিস্ট আন্দোলন হিসেবে জগতে পরিচিত হয়— যার আরো পরিণত/নব রূপ (যা বাজারে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম নামে বিদিত) লাকাঁ ও ফুকোর তত্ত্বে পুষ্ট হয়ে জাক দেরিদার 'অবিনির্মাণে' (Deconstruction) তুঙ্গে গিয়ে পৌঁছেছে। গত এক দশক ধরে এই বিষয়ে [ইংরেজি এমনকি বাঙলা ভাষায়] এত প্রবন্ধ রচিত হয়েছে যে বিদগ্ধ পাঠককুলের প্রায় সকলেরই তা জানা।

কিন্তু কিছুদিন আগেও এমনকি পশ্চিমী পণ্ডিতকুলেরও অনেকের অজানা ছিল যে, ফরাসি স্ট্রাকচারালিজমের বহুপূর্বে একদল মানুষ নীরবে বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সস্যুরের ভাষাতত্ত্বের প্রভাবে [গ্রহণে এমনকি বর্জনে] সাহিত্য সমালোচনার 'বিজ্ঞান' গড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ১৯৫৮ সালে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সেমিনারে রোমান জ্যাকবসনের বক্তৃতার আগে বহু শ্রেষ্ঠ ইঙ্গ-মার্কিন বুদ্ধিজীবীরা জানতেই পারেনি 'অচ্ছুত' রাশিয়ার ফর্মালিস্টদের কথা! যদিও ফরাসি স্ট্রাকচারালিস্ট সমালোচনা-ধারা গড়ে ওঠার পেছনে এই সব রুশ পণ্ডিতদের অবদানও ছিল কম নয়।

সাহিত্যতত্ত্ব : 'তাহাদের' কথা : দুই

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারালিস্ট ঘরানার অন্যতম পথিকৃৎ রলাঁ বার্থ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে লেখকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। কারণ, একটি রচনা কেবলমাত্র কিছু শব্দের কয়েকটি লাইন নয়, যার একটিমাত্র 'ঈশ্বরীয়' (বা পবিত্র) অর্থ আছে, বরং তা হল এমন একটি বহুমাত্রিক ভূমি যেখানে বিভিন্ন রচনা (যার কোনোটিই মৌলিক নয়) পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। কিন্তু সর্বশক্তিমান 'লেখকের' অস্তিত্বে বিশ্বাসী সুপ্রাচীন ধারণাটি ধরেই নেয় যে, লেখকের অস্তিত্ব 'রচনার' **পূর্বেই** সিদ্ধ হয়েছে এবং রচনা সবসময়েই বিরাজ করে লেখকের **পরে**— অর্থাৎ, লেখক : জনক/নিয়ন্তা, রচনা : লেখকের সন্তানবৎ/তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং বার্থের মতে, এই প্রাচীন ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য প্রয়োজন— 'লেখকের' (ধারণার) মৃত্যু এবং আধুনিক 'লিপিকারের' (scriptor) জন্ম, যে লিপিকারের অস্তিত্ব থাকবে কেবল রচনা লিপিবদ্ধ করার কালেই।

যদি বার্থের ওপরের ঘোষণাটি অবাস্তবকর মনে হয়, তবে আমাদের চূড়ান্ত বিমূঢ় করবে সাহিত্য সমালোচনার দোরিদীয় অবিনির্মাণী তত্ত্ব। সাহিত্যকে 'লেখকের নির্মাণ' হিসেবে না দেখে বার্থ এবং তাঁর প্রশিষ্যগণ সাহিত্যরচনাসহ বহুধ্বন্দ্বনময় বক্তব্য/মতামতসমূহ (অর্থাৎ বিভিন্ন ডিসকোর্স) বিভিন্ন চিহ্নজ্ঞাপনকারী দ্যোতক ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অতি [উত্তর] আধুনিক অবিনির্মাণ তত্ত্ব কোনো রচনা বা ডিসকোর্স 'বিশ্লেষণে' বিশ্বাসী নয়। তার মতে, এ এক **অসম্ভব** প্রকল্প। কারণ, কোনো রচনা কাঠামো নতুন করে ভাঙার প্রয়োজন নেই— তারা রচনার সময়েই **ভগ্নপ্রাপ্ত** হয়েছে, কারণ, ভাষার চরিত্রই এমন যে, কোনো রচনা একটিমাত্র নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপনের দাবি পরিত্যাগ করতে বাধ্য। সুতরাং নতুন করে কাঠামো বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। বরং বিশ্লেষণ প্রয়োজন সেই **সমস্যাসমূহের**, যা রচনার একটি নির্দিষ্ট অর্থ গড়ে তোলার পথে ক্রমাগত ও অনন্ত বাধা (ডিফারেন্স এবং ডেফারেন্সের সাহায্যে) দিয়ে থাকে। অর্থাৎ একটি রচনা/ডিসকোর্সের আছে অনন্ত অর্থ-সম্ভাবনা এবং স্ট্যানলি ফিশের মতে, এই অনন্ত অর্থসমূহের ওপর একমাত্র [স্বৈরাচারী] নিয়ন্ত্রণ আছে একটি বিশ্লেষণ গোষ্ঠীর— আকাদেমিক সাহিত্য-সমালোচকগণের।

এইভাবে অবিনির্মাণ পাঠককুলকে (তথা সমালোচকদলকে) এক অদ্ভুত দোলাচলের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ইতিপূর্বেই [স্ট্রাকচারালিস্ট আক্রমণে] 'লেখকের' মৃত্যু ঘটেছে, অর্থাৎ স্রষ্টা/লেখক-নিরপেক্ষ রচনা লিপিবদ্ধ হচ্ছে— পাঠক/সমালোচকের কাজ তার 'পাঠ' করা। কিন্তু 'অনন্ত অর্থসম্ভাবনা' কোনো নির্দিষ্ট অর্থে পাঠের সম্ভাবনাই বাতিল করে দিচ্ছে।

সাহিত্যতত্ত্ব : 'তাহাদের' কথা : তিন

অবিনির্মাণ যদি আমাদের এক তাত্ত্বিক অসম্ভাব্যতার দিকে ঠেলে দেয়, তাহলে রুশ

ফর্মালিস্ট ঘরানা নিশ্চয়ই সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আমাদের নতুন করে উৎসাহ দেবে। বাখতিনকে অনেকে যদিও 'পোস্ট ফর্মালিস্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু ফর্মালিজমের সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও পদ্ধতির অমিলের দিকটিই প্রবল। তবুও বাখতিনের ওপর কোনো আলোচনাই ফর্মালিস্ট পরম্পরাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। সেই প্রসঙ্গে দু -চার কথা।

অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত আগে ও পরে রাশিয়ার 'প্রগতিশীল' সাহিত্যচর্চায় অনেকগুলি ধারা বইছিল, যেমন, জঙ্গি বিপ্লবী মানসিকতার 'প্রোলেটকাল্ট', সামাজিক বাস্তবতা তথা ঐতিহাসিক পরিস্থিতি নির্ভর গোর্কি-পন্থী সাহিত্য (যা অচিরেই সরকারি অনুমোদন লাভ করেছিল), এছাড়া মায়াকভস্কির মতো সাহিত্যিকদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'ফিউচারিস্ট' আন্দোলন —যা, সাহিত্যকে 'বিজ্ঞানের বিকল্প' বা বিপ্লবী সেন্টিমেন্টের ধারক হিসেবে গণ্য না করে, তার রূপ ও কলাকৌশল আমূল পাল্টে অভিজ্ঞতার পরিচিত পথে চমক ও আঘাত দিয়ে চেনা বাস্তবকে অন্যভাবে দেখার মাধ্যম বলে মনে করত। যদিও ফর্মালিস্টদের সঙ্গে ফিউচারিস্টদের অনেক অমিল ছিল, কিন্তু (ব্যক্তিগত পর্যায়ে) পারস্পরিক আদানপ্রদান ও চিন্তায় এমন কিছু মৌলিক ঐক্য ছিল, যে অনেকে ফিউচারিস্ট সাহিত্যকে ফর্মালিস্ট সাহিত্যতত্ত্বের প্রয়োগ বলে মনে করেছেন।

প্রধানত মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গে গড়ে ওঠা ফর্মালিস্টদের ওপরে সস্যুরের ভাষাতত্ত্বের প্রভাব থাকলেও, তাঁরা সাহিত্যকে (স্ট্রাকচারালিস্টদের মতো) 'ভাষার' । অর্থাৎ ভাষা কর্তৃক] একটি নির্মাণ বলে মেনে নেননি— বরং তাঁদের মতে সাহিত্য হল ভাষার **ওপর** একটি নির্মাণ। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট একটি ভাষা-কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করলেও সাহিত্যকৃতির [প্রায়] স্বাধীন অস্তিত্ব ও তার কারণ অনুসন্ধানেই ছিল তাঁদের মূল আগ্রহ এবং এই প্রসঙ্গে সাহিত্যরচনা পাঠের চেয়ে ফর্মালিস্টদের মুখ্য আকর্ষণ হল, **কীভাবে** একটি নির্দিষ্ট ভাষা কাঠামোয় কিছু প্রয়োগ সাধারণ/দৈনন্দিন ভাষা ও অন্যগুলি 'সাহিত্য' হয়ে ওঠে ? ভিক্টর শকলোভস্কি, রোমান জ্যাকবসন প্রমুখ বিভিন্ন গোষ্ঠীর ফর্মালিস্টদের এটাই প্রধান জিজ্ঞাস্য। সুতরাং সাহিত্যরচনার চেয়ে জোর পড়ল 'সাহিত্যগুণের' (literariness) ওপর, অর্থাৎ যার ফলে কোনো রচনা সাহিত্যপদবাচ্য হয়।

এখন, এই 'সাহিত্যগুণ' কীভাবে গড়ে ওঠে ? এই বিষয়ে ফর্মালিস্টরা যে উপাদানটির কথা বলেছেন তাকে বিশ্বের বহু কবি-সাহিত্যিক (আমাদের রবীন্দ্রনাথও) তাঁদের অভিজ্ঞতায় সত্য বলে মেনেছেন। একটু খটমটে শোনালেও উপাদানটিকে এইসব রুশ তাত্ত্বিক 'অপরিচিতকরণ' (defamiliarization) বলে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ এমনভাবে তথ্য, ভাব, অনুভূতি প্রভৃতির প্রকাশ যাতে চেনা বিশ্বটিও অন্য/নতুন/অপরিচিতভাবে আমাদের কাছে হাজির হয়। শকলোভস্কির কথায়, একটি ঘটনা বা অভিজ্ঞতা যা বারংবার দেখতে দেখতে আর দৃষ্ট হয় না [অর্থাৎ অস্তিত্বের নিত্যতায় যা প্রায় অনস্তিত্বে পৌঁছয়]— তা যখন নতুন আলোয় বা অন্ধকারে আবার আমাদের

অভিজ্ঞায় ফিরে আসে— তখনই আর্টের সৃষ্টি ও সার্থকতা। বোঝাই যাচ্ছে, এই বিন্দুতেই ফর্মালিজম ও ফিউচারিস্ট সাহিত্য সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিল।

কিন্তু সাহিত্যরচনা কাকে 'অপরিচিত' করে? ফর্মালিস্টদের মতে সাহিত্য হল একটি ভাষা কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত বিশেষ রূপ বা প্রয়োগ। সুতরাং সে পাল্টে দেয়/'অপরিচিত' করে ঐ কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত সাহিত্য ব্যতীত [অথবা গৌণ/অপ্রধান সাহিত্য ভিত্তিক] অন্যান্য সাংস্কৃতিক রূপগুলি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা/অনুভূতি। যেমন 'ব্রাদারস কারমাজোভ' উপন্যাসে দস্তয়েভস্কি জনপ্রিয় রুশ রহস্যকাহিনীর ছক, কলাকৌশলকে পাল্টে নতুনরূপে উপস্থাপন করেছিলেন, বা আধুনিক কোনো লেখক পুরনো পরিচিত কোনো অ/সাহিত্যিক রচনার ওপর নতুনভাবে সাহিত্য নির্মাণ করতে পারেন। কিন্তু এই অবস্থান ফর্মালিস্টদের ঠেলে দেয় আপেক্ষিকতা ও শেষবিচারে ইতিহাস-নির্ভরতার দিকে। কারণ, সাহিত্যের ক্রিয়া (function) হল **বর্তমানে পরিচিত** সাংস্কৃতিক রূপগুলি পরিবর্তন করা। আবার বর্তমানের 'সাহিত্য' যখন অতিমাত্রায় 'পরিচিত' হয়ে যাবে, তখন তার ওপরে নির্মিত হবে ভবিষ্যতের রচনা। অর্থাৎ, আজ যা 'পরিচিত' অতীতে তাই ছিল অপরিচিত (যেমন উনিশ শতকী রোমান্টিকতা) আবার আজকের 'অপরিচিত' / 'নতুন' হবে ভবিষ্যতে পরিচিত। সুতরাং এই পরিচয়/অপরিচয় নির্ভর করবে তাদের **ঐতিহাসিক** অবস্থানের ওপর, এইভাবে, সসুরীয় প্রভাবে যদিও ফর্মালিস্টগণ একদিকে সাহিত্যরচনার কোনো উৎস খোঁজার চেয়ে রচনাটিকে একটি স্বাধীন/স্থির অস্তিত্ব বলে মনে করেছেন, অন্যদিকে সাহিত্যক্রিয়ার ওপর জোর দিয়ে তাঁরাই অপ্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যবিচারকে ইতিহাস-নির্ভর করে তোলেন।

বাখতিন ও সম্প্রদায়

ফর্মালিস্টরা যখন নিজেদেরই সৃষ্ট তত্ত্বসমস্যার আবর্তে কিছুটা বিভ্রান্ত তখন বাখতিন ও সম্প্রদায় (বিশেষত পি এন মেডভেডেভ ও ভি ভলোসিনভ) ফর্মালিজমের সসুরীয় উত্তরাধিকার অতিক্রম/অস্বীকার করে সাহিত্য ও ভাষাকে 'সামাজিক' অনুষঙ্গমূলক বিষয় হিসেবে বিচার করছিলেন এবং ফর্মালিস্টদের মতো বাখতিন গোষ্ঠীরও দাবি: সাহিত্যরচনার **বিজ্ঞান** আবিষ্কার করা। তবে সাহিত্যতত্ত্বের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল 'ভাষা' সম্পর্কে এই গোষ্ঠীর অভিমত— যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে [ফর্মালিস্ট/স্ট্রাকচারালিস্টদের মতোই] বাখতিন পন্থীদের সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান চাবিকাঠি।

তবে সে আলোচনা বিস্তারিত করার আগে বলে রাখা ভালো, বাখতিন তাঁর আশি বছরের (১৮৯৫-১৯৭৫) দীর্ঘজীবনে হাতে গোনা কয়েকটি গ্রন্থ স্বনামে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত হয়েছে আরো কিছু গ্রন্থ/প্রবন্ধ, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মেডভেডেভের *The Formal Method in Literary Scholarship* (1928) ও ভলোসিনভের *Marxism and the Philosophy of Language*

(1929)। এর মধ্যে শেষোক্তটি, বাখতিন-গবেষকদের ধারণা, বহুলাংশে বাখতিনের নিজেরই লেখা। ভলোসিনভের গ্রন্থটি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাতত্ত্ব গড়ে তোলার পথিকৃৎ প্রচেষ্টা— যা সস্যুরীয় ঘরানার বিপরীতে শব্দকে একটি ব্যাকরণবদ্ধ দ্বিমুখী চিহ্নের (দ্যোতক/দ্যোতিত) শৃঙ্খল হিসেবে না দেখে, তাকে একটি **দ্বিমুখী ক্রিয়া** হিসেবে উপস্থাপন করেছিল— যা একই সঙ্গে নির্ধারিত হয় যিনি শব্দটি উচ্চারণ করলেন অর্থাৎ সম্ভাষকের (addresser) দ্বারা এবং যার জন্য ঐ সম্ভাষণ উচ্চারিত হল, অর্থাৎ সম্ভাষিতের (addressee) দ্বারা, শব্দ/ভাষার এই চরিত্রটি 'সংলাপমূলক' (dialogical), ভাষাকে [সস্যুরীয় অর্থে] একটি স্বাধীন চিহ্নব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টাকে যা ব্যাহত করে। কারণ প্রতিটি শব্দকেই বুঝতে হবে তার নির্দিষ্ট-বাস্তব উচ্চারণের দ্বারা এবং যে উচ্চারণ নির্ধারিত হয় অবশ্যই নির্দিষ্ট **সামাজিক** প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে।

ভলোসিনভ/বাখতিনের গ্রন্থটি পরবর্তীকালের [রুশ] মার্কসীয় ভাষাতত্ত্বের প্রারম্ভিক বিন্দু হয়ে উঠেছিল— বিশেষত সস্যুরীয় synchrony-র বদলে ভাষাচর্চায় diachrony-কে [যার সরলার্থ, অনেকের কাছে, দ্বান্দ্বিক/ঐতিহাসিক বস্তুবাদ] পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু মার্কসীয় ফ্লেবারের পাশাপাশি এই গ্রন্থেই গড়ে উঠেছিল ভাষা/সাহিত্যচর্চার এমন কিছু মৌলিক ধারণা যা পরবর্তীকালে [রূপকার্থে হলেও] এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছিল যেগুলি তদানীন্তন মার্কসীয় [অর্থাৎ স্তালিনীয়] শাসকদেরও অস্বস্তিতে ফেলেছিল। সংঘাতের বীজ ছিল [স্বনামে] বাখতিন রচিত প্রথম এবং এ-যাবৎ সবচেয়ে পরিচিত গ্রন্থেই (*Problems of Dostoevsky's Art* 1929—বহুদিন পরে অবশ্য বইটি কিছু পরিবর্তনসহ *Problems of Dostoevsky's Poetics* নামে আত্মপ্রকাশ করে)— যা ঐ একই বছরে প্রকাশিত ভলোসিনভের পূর্বোক্ত গ্রন্থের তাত্ত্বিক প্রসার ঘটিয়ে সাহিত্য/গদ্য/উপন্যাস আলোচনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। পরবর্তী-কালের বাখতিনীয় বহুমুখী তাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের [যার পূর্ণ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের সীমা বহির্ভূত] ভিত্তিও গড়ে উঠেছিল এই গ্রন্থেই। বাখতিন গ্রেপ্তার হলেন, তাঁকে পাঠানো হল কাজাখস্তানের নির্বাসনে, কিছুদিন পর অবশ্য তাঁকে মস্কোর নিকটবর্তী এক প্রাদেশিক শহরে বাস করার অনুমতি দেওয়া হল।

গোটা তিরিশের দশক বাখতিনের কেটেছে প্রকাশনা জগতের বাইরে শিক্ষকতায় ও অন্যান্য কাজে, কিন্তু পাদপ্রদীপের আড়ালে এই সময় তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন এক অতি দুঃসাহসিক কাজে : নতুন চিন্তায়/দৃষ্টিতে পশ্চিম ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসের পুনর্লেখনের প্রচেষ্টায়। এই সময়ে রচিত [পরবর্তীকালে প্রকাশিত] বিভিন্ন সাহিত্য-তাত্ত্বিক প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এর পাশাপাশি চলতে থাকে ষোড়শ শতকের ফরাসি ব্যঙ্গ/হাস্য লেখক রাবেলাইকে (Rabelais) নিয়ে তাঁর অতিবৃহৎ গবেষণা— যা তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠভূমি। কী করে বাখতিন তিরিশের দশকের সরকারি দমনমূলক কার্যসূচীকে এড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে

রেখেছিলেন— সে বিষয়ে বাখতিন গবেষক/জীবনীকারগণ ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করেন। যাই হোক, ১৯৪৫ সালে তাঁর গবেষণাপত্র পেশ করার অনুমতি মেলে।

উত্তর-স্তালিন যুগে তিনি ধীরে ধীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন বিশেষত ছয় ও সাতের দশকে। তাঁর গবেষণাপত্রটিও এইসময়ে (*Rabelais and His World*, 1966) প্রকাশিত হয়, কিছু কিছু পুরনো কাজেরও প্রকাশ/অনুবাদ শুরু হয়। ১৯৬১ সালে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন এবং ১৯৬৯ সালে তাঁকে মস্কোয় বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই পর্যায়ে সাহিত্য-সমালোচনার জগতে তাঁর খ্যাতি প্রায় তুঙ্গে ওঠে (যদিও অধিকাংশ পশ্চিমী পণ্ডিতই এইসময় তাঁর নামও শোনেননি)। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

মিখাইল বাখতিন : উপন্যাস তত্ত্ব : এক

বাখতিনের বহুবিস্তৃত তত্ত্ব-প্রচেষ্টার সবকিছুর বিবরণ [এমনকি তার আভাস দেওয়া] একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয় [এবং কাম্যও নয়]। এখানে আমরা তাঁর উপন্যাস-তত্ত্বকেই (যা তাঁর সাহিত্যচিন্তার কেন্দ্রভূমি) আলোচনার জন্য বেছে নিলাম।

আমরা জানি, বাখতিনের মতে, ভাষা হল একটি দ্বিমুখী বা সংলাপমূলক (সম্ভাষক—সম্ভাষিত) সামাজিক ক্রিয়া। যেমন, একটি জীবন্ত কথোপকথনে 'শব্দ' প্রত্যক্ষভাবে, অসংকোচে অগ্রসর হয় একটি ভবিষ্যত উত্তরের/শব্দের দিকে— তাকে উস্কে দেয়, তাকে আগাম আন্দাজ করার চেষ্টা করে এবং নিজেকেও ভবিষ্যত উত্তরমুখী করে গড়ে তোলে। বোঝাই যাচ্ছে, এই সংজ্ঞায় বাখতিন সস্যুর বর্ণিত আনুষ্ঠানিক 'স্বেচ্ছাচারী' ভাষা-কাঠামোর (langue) বদলে জোর দিতে চাইছেন প্রত্যক্ষ বা কথিত ভাষার (parole) ওপর।

অন্য কথায়, এর অর্থ হল, কেবল *langue* দ্বারা আমরা *parole*-কে ব্যাখ্যা করতে পারি না। তাকে বুঝতে হবে সম্ভাষক—সম্ভাষিত-প্রসঙ্গের আন্তঃসম্পর্কের দ্বারা, এবং সাহিত্যের মধ্যে, বিশেষত গদ্য সাহিত্যের মধ্যে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, কীভাবে এই সংলাপমূলক ভাষা কাজ করে।

এইভাবে বাখতিন একটি নতুন বিন্দু থেকে [পশ্চিমী] সাহিত্যের শ্রেণীকরণ শুরু করেন, তা হল—'কথা' বা ভাষণের (Speech) দিক থেকে সাহিত্যের বিচার। অর্থাৎ, **কে** কথা বলছে বা **কার** কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে ? —এই দিক থেকেই, বাখতিনের মতে, সাহিত্যের শ্রেণী/শৈলী নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে।

অবশ্য 'speech' এর দিক থেকে সাহিত্যবিচার বাখতিনের 'মৌলিক' আবিষ্কার নয়। পশ্চিমী নন্দনতত্ত্বের জনক প্লেটো বহু পূর্বেই [মহা] কাব্যে দু-ধরনের কণ্ঠস্বর চিহ্নিত করেছিলেন— প্রথমটি, কবি লেখকের নিজের কণ্ঠ [অর্থাৎ লেখনীর যে অংশে লেখক সরাসরি তার বক্তব্য/মতাদর্শ/বিবরণ পেশ করছে] বা 'diegesis' এবং অন্যটি হল কাব্য সাহিত্যস্থিত বিভিন্ন চরিত্রের [অনুকরণ করা] কণ্ঠস্বর বা 'mimesis'। প্রথমটির

(diegesis) 'বিশুদ্ধ' প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় বর্ণনাধর্মী বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণে (hymns) এবং দ্বিতীয়টির (mimesis) 'বিশুদ্ধরূপ' হল নাটক। প্লেটোর মতে, মহাকাব্য হল এই দুইধরনের স্বরের মিশ্ররূপ— অর্থাৎ যেখানে লেখকের বিবরণ, প্রতিবেদন, সংক্ষিপ্তকরণ ও মন্তব্যপ্রকাশ এবং চরিত্রগুলি উদ্ধৃত প্রত্যক্ষভাষণ/কথা মিলে মিশে যায়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, অধিকাংশ মানুষই 'সংলাপ' বা 'ডায়ালগ' বলতে প্লেটো বর্ণিত এই 'mimesis'-কেই বোঝেন। [যদিও বাখতিনের আলোচনায় 'ডায়ালগ' কথাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে]।

মিখাইল বাখতিন : উপন্যাস তত্ত্ব : দুই

বাখতিন প্লেটোর বিন্যাসকে আরো সূক্ষ্ম, তাৎপর্যপূর্ণ এবং নতুন চেহারায় হাজির করলেন। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি প্রধান তিনটি স্পীচ/ডিসকোর্স চিহ্নিত করলেন। প্রথমত, **লেখকের প্রত্যক্ষ ভাষণ**, অর্থাৎ লেখকের রচনাবন্ধ, 'তথ্যানুগ' বিশ্বাসযোগ্য ও বর্ণনাধর্মী ভাষণ —অনেকটা প্লেটোর diegesis-এর মতো।

বহু উপন্যাসের সূত্রপাত হয় লেখকের এই প্রত্যক্ষ বর্ণনাধর্মী ভাষণের মধ্য দিয়ে। এই ভাষণের মুখ্য দুটি ক্রিয়া : প্রথমটি, একজন সর্বস্থানে/কালে উপস্থিত সর্বজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণনা, এবং দ্বিতীয়টি তার **ব্যাখ্যা**। এই বর্ণনা/ব্যাখ্যা দুভাবে সম্ভব— বর্ণনাকারীকে **অদৃশ্য** ব্যক্তি মনে করে, অর্থাৎ যখন তার কোনো পৃথক চরিত্রগত অস্তিত্ব নেই— তখন 'লেখক'— বর্ণনাকারী **একটি সত্তা** হিসেবে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়। এই ধরনের রচনায় ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রত্যক্ষভাষণে লেখকের নিজস্ব অভিমত/দর্শন ফুটে ওঠে অতিসহজেই —যদিও লেখকের ডিসকোর্সের সমস্যাবলী বাখতিন 'প্রথম' বিভাগের চেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগেই বেশি আলোচনা করেছেন।

আবার অনেক সময় (ইয়োরোপে অষ্টাদশ শতক থেকে এই প্রবণতা দেখা গেছে, এমনকি উনিশ শতকের বাঙলা উপন্যাসেও আমরা এই শৈলীর প্রভাব লক্ষ করেছি) বর্ণনাকারী/গণ (narrator/s) নিজেই উপন্যাসের চরিত্র। তখন সমস্যা দেখা দেয়— অর্থাৎ এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি শোনা যায় **লেখকের** নিজস্ব ডিসকোর্স/অভিমত —হয়তো তা বর্ণনাকারীর জবানী বা অন্য কোনো চরিত্রের কথায় প্রকাশ পায়— কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কর্তৃত্বব্যঞ্জক অভিমতটি স্বয়ং লেখকের। যদিও বাখতিনের মতে একটি সার্থক উপন্যাসে কখনোই লেখকের বক্তব্য অন্য অভিমতগুলিকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারে না— তবে সে আলোচনা অন্যত্র। এখানে কয়েকটা উদাহরণের সাহায্যে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করব।

যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম দুটি লাইন :

'৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।'

ওপরের দুটি লাইনই লেখকের প্রত্যক্ষভাষণের নমুনা বা প্লেটো কথিত diegesis। তবে প্রথম লাইনটি একটি ঘটনার **বিবরণ** দিচ্ছে এবং দ্বিতীয় লাইনটি বিবরণের সঙ্গে একটি ক্রিয়ার ব্যাখ্যাও করছে : 'দ্রুত অশ্ব সঞ্চালনে'র কারণ সূর্যের ['দিনমণি'] 'অস্তাচলগমনোদ্যোগ'। বোঝাই যাচ্ছে, এই শৈলীতে নির্মিত উপন্যাসে লেখক-বর্ণনাকারীর অস্তিত্ব একাকার হয়ে গেছে। ফলে এখানে প্রত্যক্ষভাষণের মধ্যেই লেখকের অভিমত/মূল্যায়ন প্রকাশ করার অসুবিধা নেই। যেমন, পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষের কয়েক ছত্র :

'পুরবাসী ও অপরাপর লোকের এইরূপ প্রতীতি ছিল যে, অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্র-সিংহের দীক্ষাগুরু ; বীরেন্দ্রসিংহ তাঁহাকে যেরূপ সম্মান ও আদর করিতেন, তাহাতে সেইরূপই সম্ভাবনা। এমন কি, সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য অভিরাম স্বামীর পরামর্শ ব্যতীত করিতেন না ও গুরুদত্ত পরামর্শও প্রায় সতত সফল হইত। বস্তুতঃ অভিরাম স্বামী বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ; আরও নিজ ব্রতধর্ম্মে, সাংসারিক অধিকাংশ বিষয়ে রিপু সংযত করা অভ্যাস করিয়াছিলেন ; প্রয়োজনমতে রাগক্ষোভাদি দমন করিয়া স্থির চিত্তে বিষয়ালোচনা করিতে পারিতেন। সে স্থলে যে অধীর দাম্ভিক বীরেন্দ্রসিংহের অভিসন্ধি অপেক্ষা তাঁহার পরামর্শ ফলপ্রদ হইবে, আশ্চর্য্য কি ?'

প্রত্যক্ষভাষণে বর্ণিত এই অংশে বর্ণনা/ব্যাখ্যার সঙ্গে লেখকের মূল্যায়নও প্রকাশ পেয়েছে —বিশেষত, শেষ লাইনে, যেখানে 'সংযত' অভিরাম স্বামীর বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বীরেন্দ্রসিংহ তাঁর বিশেষণ দুটি ['অধীর দাম্ভিক'] সমেত— যা বস্তুতপক্ষে লেখকের মূল্যায়ন।

বর্ণনা/ব্যাখ্যা যে কেবল লেখকের প্রত্যক্ষভাষণের দ্বারাই হয় তা নয়, অনেক সময় উপন্যাসের এক বা একাধিক চরিত্রের উদ্ভাবনমূলক ভাষণ বা ভাবনার দ্বারাও প্রকাশিত হয়। বিশেষত, [আঠারো-উনিশ শতকে গড়ে ওঠা আত্মকথা বা স্বীকারোক্তিমূলক শৈলী অনুযায়ী] যেখানে বর্ণনাকারী [গণ] নিজে [রাই] চরিত্র। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী', রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' বা সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি'। এর মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণনাকারী : রজনী, অমরনাথ, শচীন্দ্র ; দ্বিতীয়টিতে একটি চরিত্র [শ্রীবিলাস] কর্তৃক অন্যান্য চরিত্র [নিজ চরিত্রসহ] ও তাদের কেন্দ্র করে ঘটা ঘটনার বিবরণ ; আবার তৃতীয়টিতে সবটাই নায়ক সুখেনের বিবৃতি। এদিক থেকে দেখলে এই শৈলী হল mimesis বা চরিত্রগুলির অনুকরণ করা কণ্ঠস্বর। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই mimesis-এর আড়ালে কাজ করে চলে 'diegesis' অর্থাৎ কাহিনী বর্ণন ও ব্যাখ্যার ক্রিয়া।

বাখতিন বর্ণিত উপন্যাসে স্পীচের দ্বিতীয় বিভাগটি হল— চরিত্রগুলির [অনুকরণ করা] কণ্ঠস্বরসমূহ —অনেকটা প্লেটোর mimesis-এর মতো— যার আদর্শ উদাহরণ হল নাটক, কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উভয়ভাবেই এই ধরনের স্পীচ প্রকাশিত হতে পারে। উনিশ শতকের বাঙলা উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময়

এই mimesis এমনভাবে চরিত্রের প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই উদ্ধৃতিমালায় লেখক-বর্ণনাকারী তাঁর প্রত্যক্ষভাষণের হস্তক্ষেপ এত কম করেছেন যে অংশবিশেষের পাঠে ভ্রম হতে পারে যে রচনাটি/গদ্যিল উপন্যাস নয়, নাটক। যেমন, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের সেই বিখ্যাত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, যেখানে শৈবলিনী ও প্রতাপ জলে ডুবে আত্মঘাতী হতে চলেছে :

'প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ!"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। কতকাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যতবৎসর সই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশিমধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল, "চাঁদের? না। সূর্য্য উঠিয়াছে।—শৈ! আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।"

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ!

শৈ। কি?

প্র। মনে পড়ে?

শৈ। কি?

প্র। আর এক দিন এমনই সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিল না। এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল; শৈবলিনী তাহা ধরিল। প্রতাপকে বলিল, "ধর, ভর সহিবে। বিশ্রাম কর।" প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিল, বলিল, "মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?"

শৈবলিনী বলিল, "মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

প্র। তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল, "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।'

এখানে মাঝে মাঝে কিছু ভাব, অতীত ঘটনা বা বর্তমান ক্রিয়ার বর্ণনা ছাড়া লেখকের প্রত্যক্ষভাষণ নেই— বাদবাকি নাটকীয় সংলাপের মতো বাখতিন বর্ণিত স্পীচের দ্বিতীয় রূপটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু অন্যভাবেও চরিত্রসমূহের কণ্ঠস্বর/অভিমত/মনোভাব

প্রকাশ পেতে পারে— লেখকের প্রত্যক্ষভাষণের দ্বারা। যেমন, অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে, যেখানে তিতাসের প্রতিবেশী নদী বিজয়ের তীরবর্তী দুই অনাহার-পীড়িত ভাইয়ের চিন্তাভাবনা ব্যক্ত হয়েছে বর্ণনারপাশাপাশি প্রত্যক্ষভাষণে : 'উঠানের একদিকে একটা ডালিম গাছ। পাতা শুখাইয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গসুন্দরের বউ লাগাইয়াছিল। বউ যৌবন থাকিতেই শুখাইয়া গিয়াছিল। গাল বসিয়া, বুক দাঁড়ির মত সরু হইয়া গিয়াছিল, বুকের স্তন দুটি বুকেই বসিয়া গিয়াছিল তার। তারপর একদিন সে মরিয়া গিয়াছিল। সে মরিয়া গিয়া গৌরাঙ্গকে বাঁচাইয়াছে। তার কথা গৌরাঙ্গসুন্দরের আর মনে পড়ে না। তারই মত শুখাইয়া-যাওয়া তারই হাতের ডালিমগাছটা চোখে পড়িতে আজ মনে পড়িয়া গেল। উঃ বউটা মরিয়া কি ভালই না করিয়াছে। থাকিলে আজ তার অবস্থা হইত ঠিক নিত্যানন্দ দাদার মত। নিত্যানন্দ থাকে উত্তরের ঘরে। তার বউ আছে। আর আছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে। নিত্যানন্দ-পরিবারের দিকে চাহিয়া গৌরাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে! এক পেটের ভাবনা নিয়াই বাঁচিনা, দাদা চারিটা পেটের ভাবনা মাথায় করিয়া কেমন তামাক খাইতেছে। তার যেন কোন ভাবনাই নাই।

সত্যি নিত্যানন্দের আর কোন ভাবনা নাই। যতই ভাবিয়াছে, দেখিয়াছে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।...'

বলা বাহুল্য, ওপরে উদ্ধৃত অংশের 'সে মরিয়া গিয়া গৌরাঙ্গকে বাঁচাইয়াছে' —লেখকের উপলব্ধিমূলক ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গেরও উপলব্ধি/চিন্তা। এর পরের দুটি লাইনে তার নিজস্ব চিন্তা ('উঃ বউটা মরিয়া···নিত্যানন্দ দাদার মত।') প্রকাশ পেয়েছে —যদিও এই উপলব্ধি/চিন্তা গৌরাঙ্গর প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতির মধ্যেও রাখা যেত। শেষ লাইনটিও নিত্যানন্দের নিজস্ব উপলব্ধি।

তবে ভাষণক্রিয়ার উল্লেখিত দুটি বিভাগের চেয়ে বাখতিন অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তৃতীয়টির ওপর— যাকে তিনি বলেছেন : 'দ্বিমুখী ভাষণ' (doubly oriented speech)—যা উপন্যাসতত্ত্বে বাখতিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হল সেইসব উচ্চারণ/ভাষণ যা কেবল উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক কাঠামোর মধ্যেই আটকে না থেকে শৈলী / মতাদর্শের দিক থেকে উপন্যাস বহির্ভূত চিন্তা/শৈলী প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। এই বিভাগের চারটি উপভাগ আছে : শৈলীকরণ (stylization), গ্রাম্য-লৌকিক ছড়াগানের প্রভাব (রাশিয়ায় যা *Skaz* নামে পরিচিত), ব্যঙ্গাত্মক বা শ্লেষাত্মক অনুকরণ (parody) এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—'সুপ্ত মতদ্বন্দ্ব' (hidden polemic)।

'শৈলীকরণ' বলতে বোঝায় যখন একটি রচনায় অন্য কোনো কথিত বা লিখিত শৈলীর অনুকরণ করা হয়— যা লেখকের নিজস্ব শৈলীর চেয়ে ভিন্ন। এক্ষেত্রে লেখক 'অন্য' শৈলী ব্যবহার করেন তার আদি ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে— [অবশ্যই] সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে কিন্তু মূলপ্রয়োগের বিশেষ বিকৃতি না ঘটিয়ে। বিশেষ করে লেখক

ও বর্ণনাকারী যখন দুটি পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত— যেমন আত্মকথামূলক 'আমি-রূপী' কথকের ক্ষেত্রে— তখন এই শৈলীকরণের প্রয়োগ ঘটতে পারে। যেমন সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি' উপন্যাসে সুখেন চরিত্রটির ভাষা। এক অসুখী/অসুস্থ পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা প্রবৃত্তির দাস—গল্পের এই [অ্যান্টি] হিরোটি যেমন সমাজের প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে তোয়াক্কা করে না, তেমনি সমাজের তথাকথিত অভিভাবকদের চরিত্রের বড়াইকেও ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করায় এবং উপন্যাসের বর্ণনার ভাষা (diegesis) হল ছয়ের দশকের 'রকে বসা' 'বখে যাওয়া' ছেলেদের 'খিস্তি মেশানো ভাষা' যার মধ্যে মিশেছে অপরাধ জগতের সাংকেতিক ভাষা। একটা নমুনা :

'যশোদাবাবুটিও তাই। তবে তিনি তো আমার দাদা নন। তাই মস্তান করতে হল, সে দলে থাকাই আমার ভাল। কিন্তু ও লোকটারও একটা আশ্চর্য, একেবারে গালাগাল দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, খচ্চরটার ন'টা ছেলেমেয়ে। মাইরি! স্‌সাহ্‌, রাগের চোটেই করেছে, নাকি সেই প্যানতাখ্যাচা বউটাকে লেকচার দিতে দিতেই এই কাণ্ড করেছে, কে জানে। ন'টা ছেলেমেয়ে! সেই পাঁউরুটিমার্কা ফুলো ফুলো মুখে বাঁধানো দাঁতে কৃমির মতন শাদা রক্তশূন্য চোখে দলাদলির প্যাঁচ-পয়জার কষে, আর কী করে সম্ভব!'

এখানে একটি বিশিষ্ট কথিত ভাষার শৈলী প্রায় অবিকৃতভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে— গোটা বইটি এই শৈলীতে লেখা। একই জাতীয় ['আমি-কথক' কথিত] পুরনো উপন্যাস 'রজনী'তে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের শৈলীকরণ করেননি। সেখানে রজনী থেকে অমরনাথ, শচীন্দ্র এমনকি দুর্বৃত্ত হীরালাল অবধি একই ভাষায় কথা বলে— বঙ্কিমী অলঙ্কারযুক্ত সাধু গদ্যে।

অন্য দিকে গ্রাম্য-লৌকিক ছড়াগানের (*skaz*) প্রভাবে বাঙলা ভাষায় বেশ কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে। *skaz*-ও আসলে শৈলীকরণ— তবে সেই শৈলী গড়ে ওঠে লোকায়ত বিভিন্ন রসমিশ্রিত ছড়াগানের প্রভাবে। যেমন প্রায় দু-দশক আগে প্রকাশিত শংকর বসুর 'শৈশব'-এর প্রতিটি অধ্যায় রচিত হয়েছে পুববাঙলায় প্রচলিত লোক গান-ছড়াকে কেন্দ্র করে। একটি অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে এইভাবে :

'প্যাট হৈল জলন্তর
তার জন্য হই দ্যাশান্তর ॥

'আবার বর্ণনা, যাতে এই ছড়া গড়ে উঠতে থাকে, ক্রমে মূর্ত এবং শরীর পেয়ে যায়। এমন-কি প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও ঘটে দীর্ঘশ্বাস সহযোগে। তখন অন্নর সামনে অনড় এক প্রাচীন খুঁটি বা থাম, যা ধারণ করেছে আংশিক এই মাটকোটার ওজন। ঐ থামে পুরাতন পারিবারিকতা আছে।... এমন নয় যে অন্ন ঐ কথা, ছড়া, কেবল খুঁটি সাক্ষী রেখে বলে চলেছে, যেমন সে প্রায়ই বলে। কারণ, ভিন্ন শব্দ ছিল।...

'...দুঃখের ধান্ধায় ফিকিরে শরীর আউল হয়...পাথইরা মনডাও পোড়ায়...দ্যাশ যে দ্যাশ... প্যাটের জ্বালায় মাইনষে সেই চোদ্দ পুরুষের ভিটা ছাইড়া...ছুটে, ছুটে...ছুটে...।

'তখন কোথাও চীৎকার : পলাই না, পলাইনারে···। তখন কাদা অন্ধকারে ভাঙে মানুষের যুথবদ্ধ পা। কোথাও পুঁটুলি, সেই জনসমষ্টির হাতে-হাতে হাত-শিকল, ছুটছে। মাঝ নদীতে অনড় এক জলযান, ষ্টিমার গাঁ গাঁ করে ডেকে তাদের ভয়, তাদের শৈথিল্য, তাদের আড়ষ্টতা ছিন্ন করে।···নদীর ওপারে যে জলছবি বাঁশপাতা ও হিল্লোলিত ধানে নত, যেখানে লতানে গাছ ছড়ায় অন্ধকার, ভেজা ভেজা গন্ধ, বাইর-বাড়ি চণ্ডীমণ্ডপ দানশা চোরার গপ্‌পো সমেত সেই দেশ থেকে ক্রমে তারা সরে যেতে থাকে···পলায়···

'সমগ্র বর্ণনার আগুপেছু ঐ সংক্ষিপ্ত ছড়া থাকে। আর এভাবে তত্ত্বটা তৈরি হতে থাকে বলে বারংবার ছেদ।···'

দ্বিমুখী ভাষণের তৃতীয় উপভাগটি হল প্যারোডি। শৈলীকরণের সঙ্গে প্যারোডির পার্থক্য এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে যখন প্রায় অবিকৃত ভাবে 'অন্য' লিখিত/কথিত শৈলী অনুকরণ করা হয় তখন প্যারোডি শ্লেষাত্মক/ব্যঙ্গাত্মক উদ্দেশ্যে এই শৈলী বিকৃত/ব্যবহার করে। ইয়োরোপীয় উপন্যাসের ঘরানায় প্যারোডির ঐতিহ্য অতি প্রবল। তুলনায় বাঙলা সাহিত্যে এই দিকটি তত সবল নয়। তবু কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস'-এর প্যারোডি— যদিও এই প্যারোডি মূলত রচনার আঙ্গিককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসটি বিভিন্ন অধ্যায়ে রামায়ণের শৈলীতে 'আদিকাণ্ড', 'বালকাণ্ড' প্রভৃতি সাত 'কাণ্ডে' বিভক্ত। একেকটি 'কাণ্ডের' মধ্যে আবার নানা 'বৃত্তান্ত', 'উপাখ্যান' এবং প্রায় প্রতি পাতায় বিভিন্ন শব্দ/প্রবচন বা রামচরিতের শ্লোক সম্বন্ধীয় ফুটনোট রচনাটির আঙ্গিকে ধর্মগ্রন্থের গাম্ভীর্য এনেছে। আঙ্গিক ছাড়াও অবশ্য রচনার মধ্যে বর্ণনা-ব্যাখ্যা ও চরিত্রদের অভিমতের পাশাপাশি ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে তুলসীদাসী শ্লোক ব্যবহার করা হয়েছে খুব নিরীহভাবে,

"এই বোকাগুলোর কথায় ঢোঁড়াই মনে মনে হাসে, আরে এইটুকু বুঝিস না রাস্তা খারাপ না হলে তোদের রোজগার চলবে কী করে। আর এই গাড়িতেই তো ধান আসে জিরানিয়া বাজারে। ধান না হলে খোঁতস কী? সত্যি ধাঙড়গুলো বোকা। তবে একথা ঠিক যে চেরমেন সাহেব আর কলস্টর সাহেব ইচ্ছা করলে তাৎমা ধাঙড়দের অনেক কিছু ভাল করতে পারে। এই তো ধান চাল এত শস্তা করে দিয়েছে। এই সঙ্গে যদি বাবু ভাইয়াদের উপর হুকুম করে দিত, তাৎমাদের রোজ ঘরামির কাজ দিতে, তাহলেই হত বেশ। কিন্তু রামজীর মর্জি ছাড়া তো কিছু হওয়ার উপায় নেই। কখন না কখন গরীবদের কথা তাঁর মনে পড়বেই।

'গই বহোর গরীব নেবাজু
সরল সবল সাহিব রঘুরাজু।'

তিনি ছাড়া আর গরীবকে দেখার কে আছে?···"

রামায়ণের আঙ্গিককে ও অনেক পরিভাষা ব্যবহার করে উপন্যাসটি শেষ হয়—'উত্তরকাণ্ডে

'নয়, 'হতাশাকাণ্ডে'। সতীনাথ ভাদুড়ী ছাড়া সুকুমার রায় বা পরশুরামের (রাজশেখর বসুর) বিভিন্ন রচনায় হাস্যরসাত্মক প্যারোডির ছোঁওয়া পাওয়া যায়। হাল আমলে, নকশালবাড়ি আন্দোলন চলার সময় উনিশ শতকের বিভিন্ন 'নকশা' শৈলীর প্যারোডি হয়েছে।

তবে দ্বিমুখী ভাষণের মধ্যে বাখতিন সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন 'সুপ্ত মতদ্বন্দ্ব' (hidden polemic)-কে। 'সংলাপ' বা 'ডায়ালগ' বলতে বাখতিন এক অর্থে রচনার অভ্যন্তরস্থ এই 'hidden polemic'-কেই বুঝিয়েছেন— যা এমন কোনো মতাদর্শ/অভিমতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় যা আপাতদৃষ্টিতে একটি উপন্যাস কাঠামোর ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। যেমন, 'রজনী'তে প্রথমে সন্ন্যাসীর অলৌকিক/গুপ্তবিদ্যা সম্পর্কে শচীনের সন্দেহ ও সন্ন্যাসীর উত্তর এবং শেষভাগে ঐ বিদ্যা (যা কোনো হাসপাতালের সাহায্য ছাড়া রজনীর চোখ ভাল করে দিল) সম্বন্ধীয় অমরনাথের বিস্ময় এবং শচীন্দ্রের উত্তর কেবল 'বিদ্যা'টির যাথার্থ্য প্রদান করেই সন্তুষ্ট থাকেনি— নিজে থেকে লিপ্ত হয়েছে উপন্যাস কাঠামোর বাইরে— অবস্থিত একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে : যা কিছু পশ্চিমী তা-ই শ্রেষ্ঠ।

'আমি আর থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনি, এখন তুমি কি দেখিতে পাও ?" রজনী মুখ নত করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ"। আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় না হইতে পারে এমন কি আছে ? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যা কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্ত বিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন, তিনি যখন শুনিলেন, আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে ? কন্যা যে অন্ধ।' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন', তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষের দৃষ্টি সৃজন করিলেন।

আমি আরও বিস্মিত হইলাম ; বলিলাম, "না দেখিলে আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুযায়ী ইহা অসাধ্য।"'

বঙ্কিম রচনারই আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে। ব্রহ্মানন্দ ও হরলাল রায়ের কথোপকথনের অংশ :

'হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে ? তুমি লিখিবে ?

ব্র। তা কি করব ভাই। কর্ত্তা বলিলে ত "না" বলিতে পারি না।

হর। ভাল, তাতে তোমার দোষ কি ? এখন কিছু রোজগার করিবে ?

ব্র। কিলটে চড়টা ? তা ভাই, মার না কেন ?
হর। তা নয় ; হাজার টাকা।
ব্র। বিধবা বিয়ে করো নাকি ?
হর। তাই।'

বোঝাই যাচ্ছে, আক্রমণের লক্ষ্য প্রথমত বিধববিবাহতত্ত্ব এবং দ্বিতীয়ত 'বিধবা বিবাহ করলে পারিতোষিক পাওয়া যায়', এই প্রচলিত ধারণা— যদিও দ্বিতীয় ধারণাটির সঙ্গে উপন্যাসটির আপাতদৃষ্টিতে যোগ নেই।

আরেকটি উদাহরণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' থেকে। যেখানে লেখক মালোপাড়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে সহসা ধনাঢ্য ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে তাদের প্রভেদ নিয়ে শ্লেষাত্মক ছত্র রচনা করেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ধনাঢ্যজীবন বর্ণনা রচনার ঐ অংশে প্রাসঙ্গিক ছিল না।

'ওরা কারা ? ওরা মালোদের ছেলেরা। আর মালোদের মেয়েরা। ওরা তারা নয় যাদের দেয়াল ঘেরা বাড়ি, সামনে আছে পুষ্করিণী, পাশে কুয়া, যাদের আঙিনার পার থেকেই শুরু হইয়াছে পথ— সে-পথ গিয়াছে শহরের দিকে, পাশের গাঁ গুলিতে এক একটা শাখাপথ ঢুকাইয়া দিয়া। সে পথে ঘোড়ার গাড়ি চলে।'

অথবা, ধরা যাক শংকর বসুর পূর্বে উল্লেখিত উপন্যাটির কথা। স্বাধীনতা পরবর্তী-কালে এক ব্রাত্যকলোনীতে বেড়ে ওঠা 'শৈশব' কেন্দ্রিক এই উপন্যাস প্রতিনিয়ত স্বদেশ অবতীর্ণ হয়েছে অব্যবহিত অতীতের ঘটনা : যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতির সঙ্গে —যা কালগত দিক থেকে উপন্যাস-বহির্ভূত বিষয় :

'অন্ন, এখুনি এসে যাবে, এসে গেল প্রায়, আর অন্ন এসে গেলেই সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ। সে, সরি এবং অন্ন দীর্ঘকাল পরস্পরে সীমাবদ্ধ। অভ্যস্ত। কেমন অখণ্ড মনে হয়। যাতে সে ভাবে আদিতেও যেন এই তিনটি প্রাণী ছিল চরাচরে। ...তারা মন্বন্তরে মরে নি, কোনোদিন মরবে না। সদুকে পদ্য মুখস্থ করতে করতে ভাবতে হয় : তা হলে মন্বন্তরে কারা মরেছিল ? কারা বেঁচেছিল ? কেউ কি মরেছিল ? তারা কারা ? তারা কেন মরেছিল ? মন্বন্তরে !...

'মা ! অমা !
কী ?
যোগেন্দ্র, মহেন্দ্র, হরেন্দ্র চক্রবর্তী ...
কী কস হাবিজাবি, পূর্বপুরুষের নামে ঈশ্বর বসাইতে লাগে।
আচ্ছা ওরা সবাই মন্বন্তরে মরেছে না ?'

মিখাইল বাখতিন : উপন্যাসতত্ত্ব : তিন

যেমন ব্যাকরণবদ্ধ ভাষা (langue) ও বিভিন্ন নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে বহু অর্থবোধক

কথিত ভাষার (parole) মধ্যে পার্থক্য আছে, তেমনি, বাখতিনের মতে, সাহিত্যের মধ্যেও দুটি ঘরানা (genre) আছে— একটি হল, কেবলমাত্র একজন লেখকের চিন্তা/শৈলী নিয়ে গড়ে ওঠা ধ্রুপদী [আনুষ্ঠানিক নিয়মবদ্ধ] সাহিত্য— যার প্রকাশ সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় 'কাব্যে' : মহাকাব্যে, ট্র্যাজেডি বা গীতি কবিতায় (lyric) —অর্থাৎ যা গড়ে উঠছে একটিমাত্র শৈলী বা বিশ্ববীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। সাহিত্যের এই ঘরানাটিই (যা বাখতিনের আক্রমণের বিষয়) হল, বাখতিনের মতে, 'একালাপমূলক' বা 'monologic', এই ঘরানার সাহিত্যে, বিশেষ করে মহাকাব্যে, যদিও অনেক সময় বহুচরিত্রের ভাষণের প্রতিফলন ঘটে, তবুও তাকে একটি নির্দিষ্ট [লেখকের প্রাধান্য মতো] শৈলীতে বা মতাদর্শে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হয়।

অন্যদিকে, উপন্যাস চরিত্রগতভাবেই সংলাপমূলক (dialogical) বা অন্য পরিভাষায় বাখতিন যাকে বলেছেন 'বহুধ্বনিময়' (polyphonic) যার মধ্যে 'বহু' ভাষণের [যা লিখিত ও কথিত ভাষার থেকে উৎকলিত] সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায় —যার ফলেই কেবলমাত্র লেখকের ডিসকোর্স [শত চেষ্টা করেও] কোনো উপন্যাসের একমাত্র বা প্রধান ডিসকোর্স হয়ে উঠতে পারে না। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই অনেকে আধুনিক কবিতার বহুধ্বনিময়তা ও দ্বন্দ্বের দিকটির উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু বাখতিনের মতে, এগুলি হয় 'নভেলের যুগে' [অর্থাৎ আধুনিক যুগে] লিখিত কাব্য— যার ওপর উপন্যাস/গদ্য শৈলীর প্রবল প্রভাব পড়েছে— অথবা তা পুরনো অ-ধ্রুপদী হাস্য-ব্যঙ্গের লোকায়ত পরম্পরায় প্রভাবিত।

কিন্তু কী করে এই উপন্যাসের উদ্ভব হল ? এক্ষেত্রে বাখতিনের চিন্তায় একটি ক্রম-বিকাশ লক্ষ করা যায়। প্রথমে তিনি মনে করেছেন, দস্তয়েভস্কিই হলেন সেই প্রথম সাহিত্যিক যার উপন্যাসে আমরা এই 'বহু' ডিসকোর্স — বহুধ্বনির লীলা দেখতে পাই, সুতরাং উপন্যাসে সংলাপমূলক শৈলীর জনক হলেন দস্তয়েভস্কি। তাঁর আগে উপন্যাস সার্থকভাবে বহুধ্বনির 'সংলাপময় ছিল না। যদিও উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের প্রত্যক্ষভাষণের ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে বহুপূর্বেই — কিন্তু সেই সকল চরিত্রের সংলাপ/অভিমত শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে লেখকের নিজস্ব ভাষণ/মতাদর্শের দ্বারা— যেমন বাঙলায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে। রাশিয়ায় তলস্তয়ের উপন্যাসগুলিতে যদিও বিভিন্ন চরিত্র প্রত্যক্ষভাষণে (এমনকি কথ্য ভাষার দ্বারা) যোগ দিয়েছে, কিন্তু তবুও তা শেষঅবধি নিয়ন্ত্রিত/নির্ধারিত হয়েছে লেখকের ভাষণ/বিশ্ববীক্ষার দ্বারা— তাই চরিত্রসমূহের প্রত্যক্ষ/কথ্য ভাষণ ব্যবহার করলেও, বাখতিনের মতে তলস্তয়ের উপন্যাস একালাপধর্মী (monologic)।

অন্যদিকে, দস্তয়েভস্কি, যিঁনি তলস্তয়ের মতো এত বিচিত্র চারিত্রিক ভাষণ ব্যবহার করেননি— ফলে তাঁর লেখনশৈলী অনেকের কাছেই 'একঘেয়ে' [তলস্তয়ও দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে একই অভিযোগ করেছেন) —তবুও তাঁর উপন্যাসে আমরা [পরোক্ষ ভাষণের মধ্যেই] চরিত্রসমূহের এত বেশি স্বাধীন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী কণ্ঠস্বর/জীবন দর্শন

শুনতে পাই যে লেখকের মুঠি ক্রমশ আলগা হতে শুরু করে এবং তাঁর রচনা হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থে বহুধ্বনিময় বা সংলাপমূলক, বলা বাহুল্য, নিয়মবদ্ধ আনুষ্ঠানিক একক শৈলী/ভাষণ/ভাষা ব্যবস্থা, যা অন্যসব কণ্ঠস্বর/চিন্তা/অভিমতের ওপর নিজের প্রাধান্য কায়েম করে— তা বাখতিনের আক্রমণের লক্ষ্য। স্পষ্টতই বোঝা যায়, রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে এই তত্ত্ব তদানীন্তন রুশ শাসকদের খুশি করতে পারে না।

যাই হোক, প্রথমদিকে বাখতিন দস্তয়েভস্কিকেই আধুনিক [সংলাপমূলক] উপন্যাসের জনক হিসেবে গণ্য করলেও, পরবর্তীকালে আরো মনস্কপাঠে একথা বুঝতে পারেন যে, কেবল দস্তয়েভস্কির নয়, সমস্ত উপন্যাসই প্রকৃতভাবে 'সংলাপমূলক'। এমনকি উনিশ শতকী বাস্তববাদী সাহিত্যের মধ্যেও আমরা এই মতদ্বন্দ্বমূলক বহুধ্বনিময় কণ্ঠস্বর শুনতে পাই— অনেক কৌশল ও পরিকল্পনা করেও লেখক যার রাশ সম্পূর্ণ টেনে ধরতে পারে না। এই শতকের বাঙলা উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্রদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বময় মতাদর্শ/কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেছে। যেমন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে এই প্রবণতা খুব বেশি। অনেক সময়, যেমন 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়, এই কণ্ঠস্বরগুলি লেখক/বর্ণনাকারীর চূড়ান্ত রূপ গড়ে উঠতে দেয়নি।

যদিও উপন্যাসের এই বহুধ্বনিময়তার প্রয়োগ ঘটতে অনেক সময় লেগেছে, তবুও প্রাক্-উপন্যাস লেখনীর মধ্যেও [আনুষ্ঠানিক ধ্রুপদী সাহিত্যের পাশাপাশি] একধরনের হাস্য-ব্যঙ্গাত্মক ধ্রুপদী এবং মুক্ত লোকায়ত বহুমতাদর্শময় ধারাও (Carnivalsque) লক্ষ করা গেছে — যেমন রাশিয়ার *Skaz*-এ অথবা এ দেশে কবির লড়াই বা সঙ-জাতীয় পরম্পরায়। ইয়োরোপে প্রাক্-উপন্যাস যুগে এই হাস্য-ব্যঙ্গধারার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন রাবেলাই। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর রচনাশৈলী বাখতিনকে আকর্ষণ করেছে।

বাখতিনের মতে, এই জাতীয় বহুধ্বনিময়, চিত্রবৎ, স্বীকারোক্তিমূলক সাহিত্যধারার থেকেই আধুনিক উপন্যাসের জন্ম হয় উনিশ শতকে— যখন বর্ণনাকারীর ভাষণ ও চরিত্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষণগুলির মধ্যে একটা মিথস্ক্রিয়া এবং উদ্ধৃত/অনুদ্ধৃত শৈলীর মধ্যে পারস্পরিক অপূর্ব মেলবন্ধন গড়ে উঠল— যখন 'উপন্যাসই' অন্য সব সাহিত্য-রূপের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠল।

এইভাবে বাখতিন এ-তাবৎকাল সাহিত্যতত্ত্বের প্রান্তে অবস্থিত একটি রূপকে [অর্থাৎ উপন্যাসকে] পাদপ্রদীপের কেন্দ্রীয় বৃত্তে দাঁড় করালেন। এমনিতে দেখতে গেলে আনুষ্ঠানিক ভাষা হল নিস্তরঙ্গ, যান্ত্রিক ও ক্লিশে। এখন এই ভাষা বহুধ্বনিময়, বিচিত্র ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে কেবল তার **ব্যবহারের** দ্বারা —অর্থাৎ শ্লেষাত্মক অনুকরণ, অতিকথন, অন্য শৈলী নকল বা প্যারোডি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। এই জীবন্ত কথিত নানা ভাষণের সার্থক ব্যবহার ও মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সার্থক উপন্যাসের জন্ম হয়। এই কারণেই সস্যুরের বিপরীতে ভাষাতত্ত্ব হল *parole* এর ভাষাতত্ত্ব।

বাখতিন তত্ত্বের সমস্যা :

অতএব, মিখাইল বাখতিন আমাদের সামনে হাজির হচ্ছেন এক বিকল্প ভাষাতাত্ত্বিক সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে— যা প্রথানুগ [সরলীকৃত/সংকোচনবাদী] মার্কসবাদী ও স্বয়ংসৃষ্ট তাত্ত্বিক গোলকধাঁধায় দিশেহারা দেরিদীয় সাহিত্যতত্ত্বের পাশাপাশি একটি স্পষ্ট অ-সরলীকৃত/অ-সংকোচনবাদী কিন্তু বোধগম্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে— যাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যে কোনো উপন্যাস ও তার ডিসকোর্সসমূহকে নতুনরূপে চিনে নিতে পারি।

তবে প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ডেভিড লজ আমাদের বাখতিন তত্ত্বের বহুমুখী ব্যাখ্যা/ব্যবহারের সম্ভাবনা ও তার বিপদের প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমন, সস্যুরের ভাষাতত্ত্বের বিপরীতে মার্কসবাদকে সামনে রেখে সামাজিক অনুষঙ্গমূলক diachrony-কে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাথমিক বিচারে বাখতিনকে (১) আপাদমস্তক মার্কসবাদী, (২) নব্য প্লেটোবাদী এবং (৩) স্ট্রাকচারালিজম/ফর্মালিজমের তীব্র বিরোধী মনে হতে পারে।

কিন্তু এই 'ভাবমূর্তি' বাখতিনকে যত না চেনায়, আড়াল করে তার চেয়ে বেশি। কারণ, বাখতিন কোনোমতেই 'সরকারি' মার্কসবাদ গ্রহণ করেননি। সাহিত্যে 'একালাপী' শৈলী মতাদর্শকে আক্রমণ করে তিনি [রূপকার্থে] আক্রমণ করেছেন একটি সর্বাত্মবাদী [স্তালিন নিয়ন্ত্রিত] ব্যবস্থাকে, তৎকালীন সরকারি নীতির বিপরীতে তিনি নিরন্তর গবেষণা চালিয়েছেন এমন এক সাহিত্যকৃতির [দস্তয়েভস্কির] ওপর, যাকে স্তালিনপন্থীরা 'অবক্ষয়ের' [অতএব ঘৃণ্য] সাহিত্যের তকমা দিয়ে প্রায় নির্বাসিত করেছে। দ্বিতীয়ত, ফর্মালিজমের সঙ্গে বাখতিনের চলেছে ঘৃণা-প্রেমের এক দীর্ঘ 'ডায়ালগ' — বাখতিন তার বিপুল কর্মকাণ্ডে ফিরিয়ে এনেছেন সাহিত্য 'ব্যাখ্যা' করার পক্ষে ফর্মালিস্টদের পুরনো ইচ্ছা/অঙ্গীকার — মনে রাখতে হবে, রুশ ফর্মালিস্টদের অন্যতম পথিকৃৎ রোমান জ্যাকবসন বাখতিনের বিভিন্ন বিশ্লেষণের অনুরাগী ছিলেন এবং পশ্চিমী পণ্ডিত/পাঠক সমাজে [যাদের হাত ঘুরে বাখতিনের 'আলো' এই পোড়া কলোনিতেও এসে পৌঁছেছে] বাখতিনকে পরিচিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। এছাড়া, ফর্মালিস্ট/স্ট্রাকচারালিস্টদের মতো বাখতিনও ব্যবহার করেছেন বহু পরস্পর সম্পৃক্ত [binary] শব্দযুগল : একালাপী/সংলাপী, কাব্য/গদ্য, আনুষ্ঠানিক রীতিসিদ্ধ/লোকায়ত উৎসবমূলক প্রভৃতি। এবং শেষ বিচারে, এই শব্দযুগলগুলিও বিপরীতধর্মী ফর্ম ও স্টাইলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সস্যুরীয় ঘরানায়ও আমরা দেখেছি অনুরূপ binary পরিভাষার ছড়াছড়ি, যেমন সস্যুরের 'ব্যাকরণগত ভাষা' (langue)/'কথিত ভাষা' (parole) ; জ্যাকবসনের 'রূপক' (metaphor) / 'বাস্তবসম্বন্ধীয়' (metonymy) বা রলাঁ বার্থের 'পাঠযোগ্য' (lisible) ও 'লিপিযোগ্য' (scriptible) প্রভৃতি।

রূপ ও শৈলীকে নিয়ে বিপরীতমুখী শব্দযুগল গড়ে তুললে কোনো একটির ওপর অধিক গুরুত্ব/গৌরব আরোপ করার প্রবণতা থাকে। যেমন সস্যুরের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত-ভাষা গুরুত্ব পেয়েছে বা বার্থের ক্ষেত্রে 'পাঠযোগ্য' রচনার চেয়ে 'লিপিযোগ্য' রচনার গুরুত্ব বেশি। বাখতিন সস্যুরীয় ক্রম ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁর মতে, **ভাষা চরিত্রগতভাবে সংলাপমূলক**। এবং 'একালাপী' ও 'সংলাপী' সাহিত্যের মধ্যে তাঁর পছন্দ দ্বিতীয়টি। কিন্তু এখানেই একটা প্রশ্ন থেকে যায় —যার সদুত্তর বাখতিনের প্রধান রচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। তা হল, যদি ভাষা চরিত্রগতভাবে সংলাপমূলক' (dialogic) হবে, তবে তার মধ্যে আদৌ কীভাবে 'একালাপী' সাহিত্যিক ডিসকোর্স গড়ে উঠবে? অথচ বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে এই একালাপ/সংলাপের পার্থক্যের ওপর। মনে হয়, বাখতিন নিজেও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরবর্তীকালে দীর্ঘ দু-বছর ব্যাপী (১৯৫৯-৬১) লেখা এক প্রবন্ধে তিনি যেন তাঁর পূর্বধারণার সঙ্গে সংলাপরত। সেখানে তিনি প্রশ্ন করেন, সাহিত্যে কতটা পরিমাণে 'বিশুদ্ধ' একক স্বরযুক্ত এবং কোনো ধরনের প্রতিস্বন্দ্বীহীন ডিসকোর্স চলতে পারে? এমনকি কোনো ডিসকোর্স চলতে পারে, যেখানে লেখক তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পান না? সুতরাং (একালাপী অথবা সংলাপী) যে কোনো সাহিত্যিক ঘরানাই শৈলীর দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রতিস্বন্দ্বীহীন বা স্ববিরোধশূন্য হতে পারে না। প্রত্যেক লেখক (এমনকি বিশুদ্ধ গীতিকবিও) কি আসলে একজন 'নাট্যকার' নন— যিনি রচনার সমস্ত বক্তব্য/অভিমতগুলি বিভিন্ন অপরিচিত কণ্ঠস্বরের মধ্যে (যার মধ্যে 'লেখকের' নিজস্ব ও ছদ্ম ভাবমূর্তিগুলিও আছে) বিতরণ করেন।

'পরিণত' বাখতিনের এই উপলব্ধি কি তাঁর পূর্বরচিত তত্ত্বকে (অর্থাৎ একালাপী/সংলাপী পার্থক্যকে) সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে? একটু বড় দৃষ্টিতে দেখলে, তা করে না। কারণ, 'বিশুদ্ধ' একালাপ/সংলাপ বলতে যদিও কিছু নেই (যা বাখতিন পরিণত বয়সে স্বীকার করেছেন) —তবু প্রবণতা/প্রাধান্যের দিক থেকে দুটি শৈলীকে পৃথক করা যায় বৈকি। তবে মনে রাখতে হবে, এই পার্থক্য 'চূড়ান্ত' বা 'বিশুদ্ধ' নয়।

হিসেব-নিকেশ :

বাখতিন-আলোচনার এই পর্যায়ে কোনো গুরুগম্ভীর আকাদেমিক ব্যক্তি বা কফি হাউসের কোনো উঠতি আঁতেল স্বভাবতই জানতে চাইবেন : মোদ্দা ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? অতএব, [অনেক মান্যবরের কাছে এই প্রয়াসটা ক্লিশে/আকাদেমিক মনে হলেও] এবার হিসেব-নিকেশের পালা।

এটা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষত যখন আমাদের 'আকাদেমিক' তথা 'আধা আকাদেমিক' মহল স্ট্রাকচারালিজমের ঘোর কাটিয়ে দৌরিদা-জ্বরে আক্রান্ত —তখন একটি নতুন সাহিত্যতত্ত্ব গ্রহণ করার 'দ্বিমুখী' সমস্যা আছে। হয়, আমরা নতুন তত্ত্বটিকে উদ্বাহু বরণ করব— তার 'লক, স্টক এবং ব্যারেল' সমেত (যেমনটা আমরা করেছি অস্তিত্ববাদ/

স্ট্রাকচারালিজম বা অবিনির্মাণের ক্ষেত্রে), নতুবা, পুরনো প্রোথিত ধারণাটিকে আগলে আগন্তুক-তত্ত্বটিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেব।

বিশেষ করে, সাহিত্য/নন্দন তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিগত এক শতাব্দী ধরে এদেশে এমনটাই ঘটে এসেছে। পশ্চিমী আদর্শে গঠিত হলেও উনিশ শতকী [বাঙলা] সাহিত্য আচরেই 'আমাদের' [অবশ্যই শ্রেষ্ঠবর্গীয় 'আমাদের'] হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের বিশ্ব মানচিত্রে এই সময়কার বাঙলা সাহিত্যের স্থানও মোটামুটি চিহ্নিত হয়ে গেছে। কিন্তু এ তো শুধু [সাহিত্য] প্রয়োগের দিক।

অন্যদিকে সাহিত্যতত্ত্ব/সমালোচনার ক্ষেত্রে এখনও চলেছে 'তাহাদের' [অর্থাৎ 'পশ্চিমী'] যুগ। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সাহিত্যতত্ত্ব/সমালোচনার বিশ্ব-মানচিত্রে 'আমাদের' যোগদান প্রায় শূন্য। তার মধ্যে এদেশের অধিকাংশ আকাদেমিক/জনপ্রিয় গদ্য সাহিত্য সমালোচক কেবল ব্যক্তিগত নীতিবাগিশতা/পছন্দ অনুযায়ী কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরে সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করেন অথবা একদল 'বুদ্ধিমান' সমালোচক সাহিত্য সমালোচনায় সেই [পশ্চিমী] ঘরানা আত্মস্থ করেন—যাকে ক্যাথারিন বেলসি 'expressive realism' আখ্যা দিয়েছেন —যা সাহিত্যকৃতিকে লেখকের বিশ্ববীক্ষা ও তার চারপাশের জগতের বাস্তবতার প্রায় বিশ্বস্ত প্রতিনিধিত্ব বলে মনে করে— এবং [ফলে] সাহিত্যের ব্যাখ্যার জন্যে লেখকের জীবন হাতড়ে বেড়ান। কাব্যের ক্ষেত্রে তবুও শৈলী/ছন্দ বা রূপক, 'শব্দবন্ধ' প্রভৃতি রচনা-অন্তর্গত উপাদানগুলির আলোচনা প্রাধান্য পায়, কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রেই ছকটা পালটে যায়।

আর যারা 'সহজিয়া' পন্থায় বিশ্বাসী নন, তারা আরও বেশিমাত্রায় চাতকপাখির মতো চেয়ে থাকেন তত্ত্বের 'পশ্চিমী' আকাশের দিকে। ফলে [গদ্য] সাহিত্যের তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদেশের অবস্থা হল : 'আমাদের' সাহিত্য—'তাহাদের' তত্ত্ব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাখতিন আমাদের নতুন করে কোন্ কাজে লাগবেন —এমন প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যায়, আমাদের পুরনো ধারণা, এমনকি অবিনির্মাণের প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা বাখতিনের তত্ত্ব-উপহারকে কাজে লাগাতে পারি, গদ্য সমালোচনার ক্ষেত্রে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে স্ট্রাকচারালিজম/অবিনির্মাণের সঙ্গে বাখতিন তত্ত্বের মিলন অসম্ভব মনে হয়, তবুও আমরা জানি বাখতিনও, শেষ বিচারে, স্ট্রাকচারালিস্ট/ফর্মালিস্টদের মতোই শৈলী এবং রূপ [তা যতই আনুষ্ঠানিক হোক না কেন] অনুযায়ী নতুন দৃষ্টিতে সাহিত্যের ঘরানা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে তিনি যেমন ভাষাতত্ত্বে synchronyর বদলে diachronyর ওপর জোর দিয়েছেন, তেমনি শব্দকে সামাজিক অনুষঙ্গমূলক/সংলাপমূলক প্রেক্ষাপট নির্ধারিত মনে করেছেন। যার অর্থ, একটি নির্দিষ্ট *langue*-এর কাঠামোয় কোনো শব্দের একটি মাত্র fixed অর্থ থাকতে পারে না —যেহেতু প্রেক্ষাপট বিভিন্ন তাই একটি শব্দের অর্থও বিভিন্ন হবে। এইভাবে বাখতিন সস্যুরকে অতিক্রম করেন। পরে দেরিদাও আরো জটিল পদ্ধতিতে সস্যুরীয় synchrony-কে অতিক্রম করেন এবং দেখান যে একটি শব্দের

আছে 'context'-নির্ভর অনন্ত অর্থ-সম্ভাবনা। তফাৎটা এই যে, বাখতিন 'context' বলতে একটি নির্দিষ্ট শব্দের পূর্বে উচ্চারিত অন্য শব্দ ও পরে উচ্চারণসম্ভব একটি ভবিষ্যৎ শব্দের নির্ধারণ বুঝিয়েছেন, তখন দেরিদার কাছে এই context-ও বহুমাত্রিক ও অনন্ত।

আবার, বাখতিনের মতে যেহেতু ব্যাকরণবদ্ধ ভাষা-কাঠামোর দ্বারা সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দকে চেনা যাবে না, তাকে বুঝতে হবে নির্দিষ্ট উচ্চারণের দ্বারা —তখন স্বাভাবিক-ভাবেই গুরুত্ব পায় উচ্চারিত / কথিত ভাষা বা *parole*— এই উচ্চারণমূলক কণ্ঠস্বর/মতবাদ/অভিব্যক্তিকেই বাখতিন সাহিত্য রচনার অন্তর্গত 'ডিসকোর্স' বলে আখ্যা দিয়েছেন— যে 'ডিসকোর্স' বিশ্লেষণ আধুনিক ভাষা / নন্দন তথা সমাজবিজ্ঞান তত্ত্বের একটি প্রিয় / গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। অথচ তত্ত্বচর্চার এই আধুনিক প্রবণতার বহু আগেই লিপিবদ্ধ হয়েছে বাখতিনের রচনা।

এছাড়া, যখন বার্থের মতো বুদ্ধিজীবী 'লেখকের' [সর্বশক্তিমান] অস্তিত্বের জনপ্রিয় ধারণার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে লেখক-ধারণারই মৃত্যু ঘটান, তখন বাখতিন অসরলীকৃত পথে লেখকের ডিসকোর্সকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করেন অন্য ডিসকোর্সগুলির সঙ্গে। অর্থাৎ, তাঁর মতে, যদিও কোনো সাহিত্যরচনাই কেবলমাত্র লেখকের ডিসকোর্স বহন করে না এবং বহু সাহিত্যরচনায় লেখকের মতের চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে অন্যান্য অভিমত/কণ্ঠস্বর— তবুও লেখকের ভূমিকা ও অস্তিত্বকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। তাঁর ভাষায়, লেখক হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি জানেন কীভাবে ভাষাকে ব্যবহার করতে হয় অথচ নিজেকে তার [অর্থাৎ ব্যবহৃত ভাষার] বাইরে রাখতে হয়, লেখক তিনিই যাঁর পরোক্ষ ভাষণে বিশেষ দক্ষতা আছে।

এইভাবে মিখাইল বাখতিন [গদ্য] সাহিত্য বিশ্লেষণের একটি স্পষ্ট, বোধগম্য, অসংকোচনবাদী পথানির্দেশ দেন— যা সসুর-পন্থাকে অস্বীকার করলেও কখনোই 'expressive realism'এর 'সহজ' পথে ফিরে যায় না। তার মানে এই নয় যে বাখতিন 'অকাট্য' বা তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, কেবল বাখতিন কেন, কোনো তত্ত্বই অকাট্য-অভ্রান্ত নয়। ['আমাদের'] সাহিত্য রচনা বিশ্লেষণ/সমালোচনার সময় বাখতিন সহ অন্যান্য [পশ্চিমী] সাহিত্যতত্ত্বের নানা ফাঁক-ফোকর, ফাটল বেরিয়ে পড়বে— আরো গভীর অনুশীলনে যেগুলি ক্রমে পরিণত হবে বৃহৎ গহ্বরে। তখনই পশ্চিমী তত্ত্বগুলির সংকটের মুহূর্ত এবং শুরু হবে 'আমাদের' পালা। আমরা আমাদের অনুশীলন, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দিয়ে ভরিয়ে দিতে থাকব ঐ গহ্বরগুলিকে এবং একটা সময় আসবে যখন সাহিত্যতত্ত্ব আর পুরোপুরি 'derivative' থাকবে না— সাহিত্যরচনার মতোই তা হয়ে উঠবে 'তাহাদের'—'আমাদের' তত্ত্ব। তখন শুরু হবে এক নতুন গল্প— এক 'অন্য' স্বপ্নের গল্প। সেই স্বপ্নের ঘোর লাগুক আগামী দিনের সাহিত্য-সমালোচকের চোখে। □